ভারতের সেকুলারিজম সংকটে

জহর সরকার

দেশ পত্রিকা ১৭ মার্চ ২০২০

অনেকেই মনে করেন দিল্লীর সদ্য সমাপ্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যাতে পঞ্চাশ জনের মৃত্যু হয়েছে এই সরকারের চরম অকৃতকার্যতার এক নিদর্শন। কিন্তু এই ধারণা বোধহয় ঠিক নয়। এটা আসলে তাদের সুচিন্তিত পরিকল্পনার জয় এবং বিশেষজ্ঞরা চেষ্টা করছে বুঝতে শাসক দল আমাদের কি বার্তা পৌঁছতে চেয়েছে এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার মাধ্যম। নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ সর্বপ্রথম আমাদের স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন যে তাঁরা ভারতের মুসলমানদের কি ভাবে নির্বিকারে পুলিশের সামনেই সাফ করে দিতে পারেন। কেউ তাদের রুখতে পারবে না।

এবার এখনকার রাজকর্তাদের বার্তা গুলি দেখা যাক। প্রথমেই আমাদের বুঝতে হবে যে ভারতের জাতীয় রাজধানীকে ঠান্ডা মাথায় বাছাই করার কারণ হল যে বর্তমান শাসকেরা সারা দেশের জনতাকে দেখাতে চেয়েছে যে তাঁরা এখন দাঙ্গার রাজনীতিকে রাজ্য স্তরের উর্ধে সাফল্যের সাথে নিয়ে গিয়েছেন । এই শাসকেরা এখানকার সংবাদ মাধ্যমের ব্যাপারে একেবারেই চিন্তিত নন । তার প্রধান কারণ হল যে নরেন্দ্র মোদী তাঁর নিজের ভক্ত সংবাদ মাধ্যম তৈরী করে নিয়েছেন যারা সবচেয়ে জোর গলায় তাঁর হয়ে সওয়াল করে । আর যারা এখনো মোহিত হন নি বা নতি স্বীকার করেন নি তিনি তাদের মেরুদণ্ড ভাঙতে কিছুই বাদ রাখেন না । যখনই এই সরকার কোন আন্তর্জাতিক সমালোচনার সম্মুখীন হয় সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরম নেতার সাথে পরামর্শ করে বিদেশ মন্ত্রী একটি অতি ধারালো বক্তব্য রাখেন আর তার পর এই লাইন ধরে সংঘ পরিবারের সমার্থক ও ট্রোল-এরা সে বিদেশী সমালোচক কে কুৎসিত গালাগাল দিয়ে উড়িয়ে দেয় ।

এত অসহায় লোকদের মারার পরেও এই সরকার কোন দোষী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল না । এমন কি তাদের দলের কপিল মিশ্রকেও নয় যদিও সকলে জানে যে তার অতি উত্তেজনামূলক হুঙ্কারের পরেই খুনাখুনি শুরু হয়েছিল । পুলিশকে অপব্যবহার করার ব্যাপারে কিন্তু অন্য দল বা সরকারেরা খুব একটা পিছিয়ে নেই । তফাৎটা দেখা যায় যখন উচ্চ আদালতের নির্দেশে মত আর কিছু সাহসী সংবাদ মাধ্যমের তীব্র চাপে তাদের ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করেন । তখন অমিত শাহেরা বেছে বেছে মুসলমান নেতাদেরই বেশি করে তুলে জেলে পাঠাল । তাদের নিজেদের মিথ্যে কাহিনী জোরদার করার জন্যে । মৃত্যুর তালিকা থেকে অবশ্য স্পষ্ট জানা যায় যে মুসলমানেরাই অনেক বেশি আক্রান্ত হয়েছিল আর খুনের শিকারও হয়েছে তারা । কিন্তু তাতে এই গোয়েবেলসিয়ান আখ্যানের কিছু যায় আসেনা । এটাই হলো শাসকদের দ্বিতীয় বার্তা । তারা সব সময়ই প্রচার করে চলেছে যে হিন্দুরা বারবার অন্য ধর্মাবলম্বীদের হাতে অত্যাচারিত হয়েছে আর এখনো মার খাচ্ছে খুন হচ্ছে । তাই যতক্ষন না হিন্দুরা সচেতন হয়ে সংঘ পরিবারের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হচ্ছে তাদের

এক তরফা মার খেয়ে যেতে হবে ।এই ধারণাকে আরো মজবুত করার জন্যে তারা তাদের নিজেদের সমর্থকদের শত শত উগ্র প্ররোচনামূলক বক্তব্য অগ্রাহ্য করে করে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রচারক হর্ষ মন্দেরের একটি ভাষণ নিয়ে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের মুখ্য বিচারকের এজলাসে পৌঁছে গেছেন তাঁকে উপযুক্ত শাসন করার জন্যে। এই ভাষণে হর্ষ বলেছেন যে মুসলমানেরই অত্যাচারিত হয়েছে এবং আদালতের ওপর তার আস্থা হারিয়ে যাচ্ছে।

মোদী সরকারের তৃতীয় হুমকি বোঝা যায় যখন নির্লজ্য ভাবে তাদের নিজেদের দুষ্কৃতকারীদের ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেয়। শুধু তাতেই থামে না না আর এক কদম এগিয়ে তাদের পুরস্কৃত করে ও বিশেষ সম্মানও দেয় । সাধবী প্রজ্ঞা কেই দেখা যাক না । তাঁকে প্রচুর লোকের মৃত্যুর দায় থেকে এদিক ওদিক আইনের ফাঁকে যেই মুহূর্তে বার করা গেল তার পরের মুহূর্তেই মাননীয়া সাংসদের সম্মান দেওয়া হল। অভিশংসক বা সরকারি উকিলদের ভূমিকা আর অতি উদার বিচারকদের কথা তোলা বাহুল্য । অবাক হওয়ার কোন কারণ নেই যদি দিল্লির সেরা দাঙ্গাবাজ কপিল মিশ্রকে সব অভিযোগ থেকে দায়মুক্ত করা হয় । এবং তাঁকে মন্ত্রী করাও এই জামানায় খুবই স্বাভাবিক । ২০০২ এর রক্তগঙ্গার পরে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী যদি এত বড় প্রমোশন পেতে পারেন তবে অন্যরা বা কি দোষ করেছে ?

আদালতের কথা যখন উঠলোই তখন আমরা দিল্লি হাই কোর্টের বিচারপতি মুরালিধারের নাটকীয় এবং বিতর্কিত বদলির ব্যাপারটা না তুলে পারছি না । এই অতি ন্যায়পরায়ণ জজ তার দুঃসাহস দেখালেন যখন তিনি দিল্লি পুলিশের ঘৃণ্য দায়িত্বহীনতাকে সরাসরি তিরস্কৃত করলেন । তিনি অপরাধীদের প্ররোচনার ঘটনা নিজেই ভিডিও টেপে দেখলেন খোলা আদালতে এবং তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ক্রিয়া দাবি করলেন । সেই রাতেই তাঁকে বদলি করা হয় সুপ্রিম কোর্ট ও সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় । এখানে আমরা মোদী-শাহের চতুর্থ সতর্কতার পরিচয় পাই যে বিচারপতিরা যেন বেশি বিচার আর ন্যায় না দেখায় । দেখালে তাদের দ্রুত বদলি করার অভূতপূর্ব ক্ষমতা এই সরকারের আছে । এটা গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটা খুবই আশ্চর্য্য আর উদ্বেগজনক পরিস্থিতি।

অবশ্য এর থেকে যেই পঞ্চম বার্তা আমাদের কাছে পৌঁছয় সেটা আরো মারাত্বক । আমরা বেশ কয়েক দিন ধরে লক্ষ্য করছি যে সুপ্রিম কোর্ট তার নিজের বিবেচনায় ঠিক করে উপলব্দি করতে পারছে না কোন সমস্যাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ । যেমন যেই উ□সাহ ও দ্রুত গতিতে তারা নির্ধারণ করলেন যে অযোধ্যায় ঠিক কোথায় রাম জন্মভূমি মন্দির স্থাপন হবে সেই জরুরি মানসিকতার পরিচয় কিন্তু আমরা দেখিনি সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করার বৈধতা বিচার করার ব্যাপারে । কাশ্মীরের প্রত্যেকে নাগরিকের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়ার ছয় মাস পরেও তাঁরা সময় পায় নি এ বিষয়ে তেমন গুরুত্ব দিতে । শাহীন বাগের প্রতিবাদীরা রাস্তার একাংশ বেআইনি ভাবে দখল করছে তাদের তীক্ষ্ণ নজর এড়ায় নি। কিন্তু যেই নাগরিকত্ব কানুনের বিরুদ্ধে ঘরের বৌয়েরা পথে নাবতে বাধ্য হয়েছে সেটা বৈধ কি না বিচার করে উঠতে পারেন নি। এর ফলে প্রধান

মন্ত্রী তাড়াহুড়ো করে সংসদে যা চান তা পাশ করে ভারতের মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়ে মানব অধিকার খর্ব করতে পারছেন।

আর ছ নম্বর হুঁশিয়ারি তো আমরা দলিলের গণহত্যার আগে থেকেই টের পেয়েছি। আর তা হল যে কোন সাংবিধানিক বা নাগরিক অধিকার রাক্ষ্যার সংস্থার দ্বারস্থ হয়ে কোন লাভ নেই। সব কটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা মোদী এক এক করে কব্জা করে নিয়েছেন তার বাছা বাছা লোক বসিয়ে । তাদের মধ্যে এমন চরিত্রের বেশ কয়েকজন আছে যাদের আনুগত্য শুধু তাদের প্রভুর কাছে সংবিধানের প্রতি নয় । নির্বাচন থেকে অর্থনৈতিক অপরাধ, ক্যাগ থেকে দুর্নীতি তদন্ত বা রিসার্ভ ব্যাঙ্ক অথবা RTI সবই এখন তাঁর অস্ত্র। এদের অপব্যবহার করে তার মনের হিন্দু ও হিন্দি রাষ্ট্রীয় তৈরী করছেন তিনি নির্দিধায়। তিনি ধরেই নিয়েছেন যে ২০১৯ এর নির্বাচনে জেতার অর্থ হল যে জনগণ তাঁকে মুসলিম মুক্ত হিন্দু হিন্দুস্তানের গড়ার দায়িত্ব ন্যস্ত করছে । আমরা মানছি যে মানুষ অন্য দলেদের ঝগড়াঝাটি ও বিরোধীদের অপধার্ততায় বিতশ্রদ্ধ হয়ে এক শক্তিশালী নেতাকে জয়ী করছে । কিন্তু তার মানে এই না যে তারা সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে ভোট দিয়েছে বা মুসলমানদের জবাই করার অনুমতি দিয়েছে । তাঁর দল বা অন্ধ ভক্তরা এ কথা মানতেই রাজি নয়। মানুষ চেয়েছে একটি স্বচ্ছ ও পারদর্শী সরকার যার প্রচেষ্টায় কোটি কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং জাতির অর্থনৈতিক উন্নতির শ্রীবৃদ্ধি হবে।

কিন্তু এটাও আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে প্রচুর মানুষ একনায়কের পক্ষে। গণতন্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে যেই সংঘাত আর দ্বন্দ অনিবার্য্য তা অনেকেই মানতে পারে না এবং তারা সব সময় স্ট্রংম্যানের জন্যে ব্যাকুল হয়ে বসে থাকে। এটা শুধু আমাদের দেশের বা কালের গল্প না এই উৎসুক কামনা সব দেশে বা যুগে দেখা যায়। সেই সোনার খাঁচার পাখি আর জঙ্গলের মুক্ত পাখির কাহিনী । এই কথাটাও আমরা মানতে বাধ্য হই যে জাতীয় স্তরে ইন্দিরা গান্ধীর পরে মোদীই দ্বিতীয় স্বৈরাচারী প্রধান মন্ত্রী। কিন্তু রাজ্য স্তরে এদের অনেক আগে থেকেই আমরা দেখতে পাই যারা কোন অংশে কম নয়। আজকের ভারতে এই একনায়কের ভক্ত শ্রেণী নরেন্দ্র মোদী কে প্রাণ থেকে পূজা করে । কিন্তু তার মানে এই না যে তাদের এখন এমন শক্তি আছে যে তারা আমাদের গণতন্ত্রকে ধূলিসাৎ করতে পারে। প্রচুর ক্ষতি করতে পারে এবং তারা তাই করছে । তারা এটাও স্বীকার করতে নারাজ যে তাদের মহান নেতা তার সুমধুর ভাষণের কোন প্রতিশ্রুতিই পালন করতে পারেন নি। কিন্তু আমাদের দুঃখের সাথে আর একটি সত্যকে মানতে হচ্ছে আর তা হল হিন্দুদের এক বৃহৎ অংশ অনেক পাল্টে গেছে। বর্তমান বাতাবরণে তারা খুলাখুলি ভাবে মুসলমান বিদ্বেষ প্রকাশ করতে বিন্দু মাত্র সংকোচ বোধ করে না। এটাই সবচে বেশি চিন্তার কারণ। প্রায় সাত দশক ধরে সাম্প্রদায়িক উক্তির ওপরে যেই সামাজিক বাধা ছিল হঠাৎ মোদী আসতেই কোথায় যেন তা হারিয়ে গেল । আমরা এখন দিনরাত সম্মুখীন হচ্ছি এই উগ্র হিন্দুবাদীদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে অফুরন্ত গালাগাল । সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হল যে এই ভর্ৎসনার নেতৃত্বে আছে প্রচুর উচ্চ শিক্ষিত এবং উচ্চ বর্ণের লোকেরা। এর আগে আমরা সত্যি কল্পনাই করতে পারি নি যে তারা এত উচ্চমানের শিক্ষা পাওয়া সত্বেও আর এত উদার সমাজে বড় হওয়ার পরেও নিজেদের মধ্যে এত ভয়ঙ্কর জেনোফোবিয়ার বিষ পুষতে পারে।

এর মানে কি ভারতবর্ষের সেই অতি গর্বিত ধর্মনিরপেক্ষতার যুগ শেষ ? হটা□ কি হল বোঝার চেষ্টা করা যাক । এই বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে আমাদের ঠিক করতে হবে কোন ধর্মনিরপেক্ষতার কথা আমরা বিবেচনা করছি। সেকুলারিজমের দুটি পৃথক ব্যাখ্যা বা মর্ম আছে । একটি আমরা পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষতা বলে চিহ্নিত করতে পারি আর দ্বিতীয়টি কে আমরা আমাদের ভাষায় গান্ধীয় সেকুলারিজম বলা যাক । পশ্চিমী দুনিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হল ধর্মের থেকে রাষ্ট্রের একেবারে আলাদা আর তাদের মাঝে এক বিশাল প্রাচীর থাকার প্রয়োজন। এই দূরত্ব বুঝতে গেলে ইউরোপের ইতিহাসে প্রবেশ করার দরকার যেখানে আমরা দেখি কয়েক শতকের ধর্মীয় যুদ্ধের রক্তাত্ব কাহিনী । আমরা দেখি চিন্তার জগতে এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে খ্রীষ্টান ধর্মের একচেটিয়া শাসন । তর্ক যুক্তি ও বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে কি অত্যাচারই না হয়েছে ধর্মের নামে। যুক্তিবাদীদের ও বৈজ্ঞানিকদের নিষ্ঠুর শাস্তির গল্প আর প্রাণদণ্ডের কিংবদন্তির কথা আমরা সকলেই জানি। অক্লান্ত সংগ্রামের পর স্বাধীন চেতনার জয় হয় আর তার ফলে যুক্তি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ আসে ইউরোপে। আর সাথে আনে শিল্প কল কারখানা শোষণ উপনিবেশ ও অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নতি। খ্রিস্টান চার্চ আর ধর্মকে বহু দূরে সরিয়ে দিল পশ্চিমী সমাজ ও রাষ্ট্র। আমাদের দেশের তখনকার অনেকে নেতারা পশ্চিমে পড়াশুনা করেছেন আর এই জীবনদর্শনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন। জওহর লাল নেহেরু তাঁদের অন্যতম এবং এক অর্থে প্রধান। তিনি যুক্তিবাদকে মনেপ্রাণে আলিঙ্গন কোরেছিলেন আর তার সাথে সাথে তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে তাঁর ধৰ্ম হিসাবে মানতেন। ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রাধান্যের জন্যে অনেকের কৃতিত্ব আছে । কিন্তু সাধরণত এই সেকুলারিজমকে আমরা নেহেরুবাদী নীতি বলে থাকি যেখানে পশ্চিমী আকারে ধৰ্ম আর রাষ্ট্রের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখার স্পষ্ট নির্দেশ আছে । মার্কসীয় এবং অন্যান্য সমাজবাদীরা ধর্মের ব্যাপারে আর তীব্র সমালোচক কিন্তু তারাও নেহেরুর নিরীশ্বরবাদের নীতিকে সমর্থন করতেন ।তাঁর আত্মজীবনীতে নেহেরু বার বার লিখেছেন তিনি ধর্ম ও ভগবানকে কত দূরে নিক্ষেপ করেছেন ।ধর্মকে তিনি আতঙ্কের চোখে দেখতেন। আর এই স্বচ্ছ সেকুলারিজমকেই আমাদের দেশের বাম এবং উদারপন্থী লিবারেলেরা সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করেছে। তারা কিন্তু দুটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য ভুলে যাচ্ছে। প্রথমটা হল যে ভারতবর্ষ কখনই ইউরপের সেই ধর্ম বনাম যুক্তিবাদের লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে যায় নি আর আমাদের ইতিহাস একেবারেই অন্য রকমের। আর দ্বিতীয় পার্থক্য হল যে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ ধৰ্ম ছাড়া এক পাও চলে না। তার ধর্মতে গভীর বিশ্বাস রাখে সে হিন্দু হোক বা মুসলমান অথবা শিখ খ্রিস্টান। এই দারুন সত্যকে অগ্রাহ্য করলে আসল ভারতকে চেনা বা বোঝা যায় না। তা সত্ত্বেও প্রথম চার দশক এই সেক্যুলারিজমকে নিয়ে আমরা দিব্যি চালিয়ে দিয়েছি।

এর এক বিশেষ কারণ হল যে নীতিগত ভাবে আমরা নেহেরুবাদী ধর্মনিরপেক্ষতায় যতই আস্থা রাখিনা কেন আসলে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা গান্ধীয়ে অনুশীলন মেনে চলত
।

মহাত্মা গান্ধী গভীর ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন আর তার সাহেবি শিষ্য জওহর লালের সাথে অনেক ব্যাপারে একদম বিপরীত । তিনি এই দেশের মানুষকে খুব ভাল ভাবেই বুঝতেন

চিনতেন। অতএব তিনি জানতেন যে হিন্দুরা রামাযান মহাভারত পুরাণের কাহিনীতে ডুবে থাকে ঠিক যে ভাবে মুসলমানেরা তাদের আল্লাহ আর নিয়ম কানুনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখে।গান্ধীজী খুব সরল ভাষায় তাঁর দেশভক্তির রাজনীতি আম জনতাকে বোঝাতেন এবং তিনি ধর্মীয় কাহিনী থেকে উদাহরণ দিয়ে মানুষের আর কাছে যেতেন। তাঁর সেকুলারিজম কিন্তু ধর্ম থেকে অ্যান্টিসিপেটিক দূরত্ব রাখার কথা চিন্তাই করতো না। ভারতের সরকার যতই নেহেরুপন্থী ধর্মনিরপেক্ষতার বাণী দিক আসলে গান্ধীর সব ধৰ্ম সমান নীতি মেনে সকলের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দিনে ছুটি ঘোষণা করে। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান তাদের নিজেদের জগতে বাস করে আর আমরা খুব একটা চেষ্টা করি নি অন্যের ধর্মের মাহাত্ম্য বা মর্ম অথবা আচার বিচার বোঝার। কিন্তু একটা কথা মানতে হবে। গান্ধী রাম ও রাম রাজ্যের কথা তার বাণীর মধ্যে এত ব্যবহার করতেন কিন্তু কেউ তাঁকে সাম্প্রদায়িক বলার সাহস করে নি। রাম তখন এই দিকে ছিল হিন্দুবাদীদের দিকে নয়। রামকে কি ভাবে সাম্প্রদায়িক শক্তির অস্ত্র তে পরিণত করা হলো দেখা যাক। এই খেলা শুরু হয়েছিল ১৯৮৯ সালে।

মনে রাখতে হবে যে আক্রমনাত্মক হিন্দু রাজনীতির কার্যকরের শুরু করার ঠিক ২৫ বছর পরে নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রীর পদে যোগদান করেন। তার মানে আমাদের কাছে এতখানি সময় থাকা সত্ত্বেও আমরা আমাদের ভয়ঙ্কর বিপদকে ঠেকোবার তেমন কোনগুরত্বও দেইনি বা চেষ্টাই করিনি। আর ১৯৮৯ সালের তা□পর্য উপলব্ধি করতে গেলে আমাদের কিছুটা পিছিয়ে যেতে হবে ১৯৮৬ সালে৷ এই বছরে, যেই কংগ্রেসে ঠিক দুই বছর আগে ১৯৮৪ সালের নভেম্বরের লোকসভা নির্বাচনের জয়ে রেকর্ডকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছিল, সেই দল বোফর্স বন্দুক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে জোর ধাক্কা খেলো। রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে ঘুষের অভিযোগ আসার পরে তারা আতঙ্কে ভুগতে শুরু করেছিল। রাজীব তখন মুসলিম চরমপন্থীদের তুষ্ট করার জন্যে মুসলিম মহিলা (বিবাহবিচ্ছেদের উপর সুরক্ষা) আইনটি নিয়ে প্রচুর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। তার আইনটি শাহ বানো মামলায় হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের আদেশে বাতিল করে দিল। আদালতের নির্দেশে ছিল যে প্রাক্তন স্বামীদের তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম মহিলাদের দায়িত্ব অবশ্যই নিতে হবে। এই ধর্মাবলম্বীদের ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ কংগ্রেসের রূপান্তরটি হিন্দুদের পদমর্যাদার অনেকে ক্ষুন্ন করে, যা শীঘ্রই বিজেপি মুখ্য প্রসঙ্গ করেছে। ১৯৮৬ সালের শেষের দিকে, রাজীব গান্ধীর তথ্য ও সম্প্রচারের দায়িত্বে থাকা মন্ত্রী অজিত কুমার পাঞ্জা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশন, দূরদর্শনে রামায়ণ নামে একটি ধর্মীয় সিরিয়াল চালু করার অনুমোদন দেন। এটি একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বহু বছরের নীতি যাতে কোনো একটি ধর্মকে প্রাধান্য না দেয়ার কথা ছিল লঙ্ঘন করল। রামাযান সিরিয়ালটি ১৯৮৭ সালের জানুয়ারী থেকে প্রচার শুরু হয় এবং ১৯৮৮ সালের জুলাই পর্যন্ত চলেছিল। আমরা সকলেই জানি এটি মানুষের মধ্যে কি পরিমানে জনপ্রিয় হয়েছিল।

এর পরে, এই মহাকাব্যের টেলিভিশন সংস্করণ পরে আরও একটি মহাভারত, দেখানো শুরু করল দূরদর্শন, যা ১৯৮৮ সালের অক্টোবর থেকে জুলাই ১৯৯০ পর্যন্ত চলেছিল। আমরা জানি, জনপ্রিয় টেলিভিশন সিরিয়ালগুলি আবেগকে আরও রঞ্জিত করে এবং সবকিছুকে "সর্বনিম্ন সাধারণ ডিনামিনেটরে" নামিয়ে আনে। আমাদের দুই মহাকাব্য অতি

সহজ করতে গিয়ে ভারতের তর্কাত্মক এবং নিবিড় সহনশীল সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে পারেনি। তবে লক্ষণীয় ঘটনাটি হ'ল রঙিন টিভি নামে এই নতুন আশ্চর্যতার যাদু রাম, সীতা, লক্ষ্মণ এবং হনুমানকে সাধারণ হিন্দুর ঘরে ঘরে নিয়ে এল। এবং এরা জীবন্ত হয়ে উঠল।এই অদ্ভুত রূপান্তর এর আগে কখনও হয়নি। দূরবর্তী কাব্যিক চরিত্রগুলি, যাদের গল্পগুলি এর আগে পন্ডিত এবং বৃদ্ধরা কথকথার গন্ডির আবদ্ধ ছিল হটা□ টেলিভিশিনের মারফত সকলের কাছে প্রাণবন্ত হয়ে পৌঁছাল। দেবদেবীরা চলে এল বাস্তব-জীবন, হয়ে উঠল নিকট-স্পর্শ। দূরদর্শন অজ্ঞাতসারে জনপ্রিয় ধর্মীয় উত্সাহের নতুন ঢেউয়ের সৃষ্টি করল । আর সেই ঢেউয়ের সুযোগ আর লাভ তুলতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সংঘ পরিবার। আশ্চর্য্য ব্যাপার হল এই বিষয়টি ভারতীয় গবেষেকদের নজরে খুব একটা পড়ে নি । ক্রিস্টোফ জাফরেলো, বারবারা স্টোলার মিলার, জেমস হেগোর্টি, ডেভিড লুডেন, ভিক্টোরিয়া ফার্মার এবং ফিলিপ লুটেনেডর্ফের মত বেশ কয়েকজন বিদেশী চিন্তাবিদ অবশ্য মন্তব্য করেছেন । তাঁরা ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত এবং সাম্প্রদায়িকতার উত্থানের সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

১৯৮৯ এক যুগান্তকারী বছর, যখন মাত্র নতুন নয় বছরের পুরনো দল, বিজেপি রামকে নিয়ে মাঠে নামল ।এবং তাদের সহযোগী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, কিংবদন্তি রামকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করতে আরাম্ভ করল। তারা সুদূর অযোধ্যা শহর যেখানে রামের জন্ম হয়েছিল বলে মনে করা হয়, জাতীয় রাজনৈতিক উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দু বানাল । এর ফলে ১৯৮৯ সালের শেষেদিকে দলটি কীভাবে লোকসভা আসনগুলির সংখ্যা মাত্র ২ থেকে ৮৫ এ বাড়াল তা বুঝতে আমরা জানুয়ারি থেকে শুরু করতে হবে । সেই মাসে ভিএইচপি ঘোষণা করেছিল যে অযোধ্যায় বিতর্কিত স্থানে রাম মন্দির স্থাপিত হবেই হবে। এটা তাদের দৃঢ় সংকল্প এবং তারা নভেম্বের মাসেই এটির পবিত্র শিলান্যাস অনুষ্ঠিত করবে। অল ইন্ডিয়া বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটি এগিয়ে মাসেই পাল্টা "প্রতিরিক্ষা স্কোয়াড" গঠন করতে শুরু করল। এর ঠিক পরেই প্রয়াগ কুম্ভ মেলায় জড়ো হওয়া হিন্দু জনসমুদ্র গর্জে সমর্থন জানাল। আর সন্তু সম্মেলন থেকে হিন্দু কর্মসূচী আরও বেশি শক্তি সঞ্চয় করল। রামের নামে সকলের পূর্ণ সমর্থন পেলে। সংঘের বরাবরের প্রচার ছিল হিন্দুদের উপর ক্রমাগত অত্যাচার চালিয়েছে ইসলামীয় ও ব্রিটিশ শাসকেরা। কিন্তু এরপর সংঘের নুতন কৌশল হল ‘মুসলিমপন্থী কংগ্রেস’-এর অধীনেও হিন্দুদের আর বেশি বিপিন্ন। একমাত্র তারাই রামের জন্মস্থান ‘মুসলিম আক্রমণকারী ’এর হাত থেকে উদ্ধার করতে পারে। বছরব্যাপী প্রচারটি যুদ্ধাপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং ধর্মনিরপেক্ষ বাহিনী হতভম্ব হয়ে পুরোপুরি পিছিনে চলে যায় ।নিরীশ্বরবাদী বামপন্থীরা একেবোরেই অনুমান করতে পারল না একটি রামায়ণ সিরিয়াল জনগণকে কতটা মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল। নেহেরুবাদী সেকুলার বুদ্ধিজীবীরাও এই উন্মাদনা বুঝতে ব্যর্থ হল । বাম উদারপন্থীরা হিন্দু মহাকাব্য এবং পুরাণ থেকে প্রচুর দূরত্ব রাখার পরিনাম হল যে তারা কেউ বুঝতেই পারল না   একটি কাল্পনিক পৌরাণিক চরিত্র কীভাবে এতটা হিন্দু উদ্দীপনা পুনরায় সংজ্ঞায়িত করতে পারে। এবং উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। এই ১৯৮৯ ও ১৯৯০-এর সময় দূরদর্শন লাগাতার মহাভারত সিরিয়াল চালিয়ে যায় এবং হিন্দুদের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে নুতন করে ধর্মের অ্যাড্রিনালিন ইঞ্জেকেশান দিতে থাকে।

দিতে অসাম্প্রদায়িক শক্তির নিন্দা আর তীব্র সমালোচনার সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করল মৌলবাদীরা। সংঘ পরিবারটির নুতন স্ট্রাটেজি হল প্রতিটি হিন্দু বা গোষ্ঠীকে মন্দিরের জন্য কেবল একটি ইট দান করার অনুরোধ। অনন্য এবং চতুর এই প্রচার ভালোই কাজ করে। সারা বছর ধরে ধরে শুধু উত্তেজনা এবং উত্তেজনা। এবং ঘটনাক্রমে, ১৯৮৯ সালের নভেম্বরের দুটি বড় ঘটনা ভয়ানকভাবে একসাথে জড়িয়ে যায়। সংঘ পরিবার রাম মন্দির গড়ার বিষয়ে তার গুরুতর প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করার জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষিত রামশিল পূজানের আয়োজন করেছিল এবং বিজেপি একই মাসে লোকসভা নির্বাচনে ৮৫ টি আসন লাভ করে। রাম সত্যিই তাদের আশীর্বাদ করেছিলেন। দলটি ভিপি সিংয়ের অপরিহার্য সঙ্গী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ভি পি সিংহের সংখ্যালঘু সরকার ডিসেম্বর ১৯৮৯ থেকে নভেম্বর ১৯৯০ অব্দি টিকিল শুধু বিজেপির আসনগুলির বিশাল অংশের উপর নির্ভরশীল হয়ে। এই সমর্থনের জন্য বিজেপি কীভাবে সিংকে চাপে রেখেছিল অনুমান করা যায় আর এই ১৯৯০ সালে ক্ষমতার সম্পূর্ণ অপব্যবহার করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়াল। সিংহ ও কম যায় না। তিনি আগস্টে মণ্ডল কমিশন রিপোর্টকে স্বীকার করে এবং শিক্ষা এবং চাকরির ক্ষেত্রে 'অন্যান্য অনগ্রসর জাতি' (ওবিসি)জন্যে 27 শতাংশ সংরক্ষণ করে। এক ধাক্কায় তিনি হিন্দু ভোট বিভক্ত করে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে আমরা আরও বিশদে বিস্তারিত জানব।

কোণঠাসা বিজেপির ভরসা শুধু ভগবান রাম। রাম-অযোধ্যার কে নিয়ে দলের সভাপতি লাল কৃষ্ণ আডবাণী ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে তাঁর যুদ্ধের রথ, রাম রথ যাত্রা শুরু করলেন সারা দেশে জুড়ে। সাড়াও ফেলেছিল। এর ফলে যুদ্ধের আবেগে ও দাঙ্গা গণহত্যার ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে এবং বেশ কয়েকটি জায়গায় পুলিশ গুলি চালায়।এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কয়েক শত লোক মারা যায়।চার দশকেরও বেশি সময় ধরে ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক নীতি ও আখ্যানের একচেটিয়া রাজের এই প্রথম ভয়ঙ্কর ধাক্কা। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মসজিদটির ধ্বংসের কথা স্মরণ করা বাঞ্ছনীয়, যা মুম্বাইয়ের সিরিয়াল বিস্ফোরণের মতো বৃহত্তর দাঙ্গা ও সন্ত্রাসবাদের কারণ করেছিল। এগুলি সংস্কারের বাইরে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে হিন্দু মুসলিম সম্পর্ককে ভেঙে দিল। ভারতের ইতিহাস কখনই ভুলবে না নরসিমহ রাওর সেক্যুলার কংগ্রেস সরকার কি নির্লজ্জভাবে দায়িত্বগুলি বর্জন করেছিল। এই দুর্দিনে কেবল উত্তর প্রদেশে আর বিহারে দুই যাদব সরকার মাঠে নেবে মোকাবিলা করার সাহস দেখাল।দেখাল বাম অ সেকুলার বুদ্ধিজীবীরা সভা প্রতিবাদ মিছিল আর পুস্তিকা প্রকাশ করতে ব্যস্ত ছিলেন।

আমরা চট করে একটু ইতিহাস স্মরণ করলাম এই জন্যে যে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে আমরা দীর্ঘ পঁচিশ বছর পেয়েছিলাম মৌলাবকে কিছু খানি ঠিকো দিতে সেই ১৯৮৯ থেকে ২০১৪ অব্দি। এই পঁচিশ বছরে কংগ্রেস ও তাদের সমর্থনের সরকার রাজ করেছে ষোল বছর আর বাকি সময়ে হয় অটল বিহারী বাজপেয়ীর তার যথেষ্ঠ উদার সরকার চালিছেন নয় নির্বাচনের প্রস্তুতিতে সকলেই লেগে ছিলেন।সবাই জানে যে কংগ্রেসে আমলে মার্ক্সবাদী ও অন্যান্য বামপন্থীরা পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। এই সময়ে বা ছয় সাত দশকে আমরা আমাদের ইতিহাসের পাঠ্য কেতাবে মুসুলমান বিরোধী অংশ গুলি কে ঠিক করে বোঝাতে পারিনি কেনে। আমরা যদি

সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতাম যে প্রায় প্রত্যেকটি বহিরাগত গোষ্ঠী প্রথমে তাদের বল প্রয়োগ করছে আর অত্যাচারও করছে কিন্তু তারপরে এই ভারতের শরীরে মিশে গিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করছে। "কেহ নাহি জানে কার আহবানে কত মানুষের ধারা ....এক দেহে হল লীন।" শুধু মুসলমানরা আক্রমণ করে নি তবে তাদের এত শত্রুর চোখে দেখো কেন ? তারা ভারতকে কি উপহার করছে তার এক বাক্যের ও উল্লেখ নেই কোথাও ।কোথাও আমরা কখনও বলি না যে অনেকে হিন্দুরা বৌদ্য ধর্মের ধংস তে লিপ্ত ছিলেন । প্রত্যেকটি বৌদ্ধ স্তুপ মহাবিহার ও চৈত্য কি করে শুধু ভেঙে পড়েনি বা ভাঙা হয়নি তাদের সম্পূর্ণ অস্তিত্বের কথা আমাদের স্মৃতি থেকে একেবারে মুছে দেওয়া হল । ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ প্রত্নতত্ববিদেরা হিমশিম খেয়েছে অমরাবতী অজন্তা Taxila সারনাথ সাঁচী বুদ্ধ গয়া খুঁজে বার করতে কেননা কেউই জানত কোথায় তারা তারাএরপর পাহাড় প্রমান মাটি সরিয়ে তাদের উদ্বার করা হল। আজ কি কেউ মানতে রাজি হবে যে দুই সহস্রাব্দ ধরে ব্রহ্মাণ্য ইতিহাস সম্রাট অশোকের কাহিনী একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম আর জেমস প্রিন্সেপ যদি ১৮৩৭ এ তাঁকে নুতন করে আবিষ্কার না করতেন আমরা বোধয় ভুলেই থাকতাম । হিন্দু বৌদ্ধ সংঘাতের গল্প যদি এত সুন্দর ভাবে ভুলেযেতে পারি তবে মুসলমান পর্ব কে আমরা অন্য ভাবে দেখতে পারি নি কেন ?

এখন যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। আমাদের সর্বপ্রথমে মানতে হবে যে মৌলবাদীর জয়ের পিছনে আমাদের বিশাল ভূমিকা আছে । ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা ধরেই নিয়েছিল যে তাদের জামানা শত শতাব্দীর জন্যে। প্রথমেই আমাদের ভুল কবুল করতে হবে যার চেষ্টা আমরা এখন করলাম । তারপর শুধু মৌলবাদীদের সমালোচনা বন্ধ করে নিজেদের রণকৌশল নুতন করে গড়তে হবে। "লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার"।